তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

কেমন মানুষ গড়ছে মুসলিম দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

উ গ্র প ন্থা ও উ চ্চ শি ক্ষা

মশিউল আলম

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব শারজা

নিদাল গুয়েসুমের জন্ম মরক্কোতে, আলজিয়ার্সের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য চলে যান আমেরিকায়। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, স্যান ডিয়েগো থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন, পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে কাজ করেন নাসায়। আরব দুনিয়াসহ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মেধাবী শিক্ষার্থী, বিশেষত তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রতি যাঁদের আগ্রহ, তাঁরা শিক্ষকতা ও গবেষণার সুযোগ পেলে ইউরোপ-আমেরিকায় থেকে যান। কারণ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উন্নত ও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী প্রতিষ্ঠান নেই, অর্থ নেই, উদ্যোগ নেই, আগ্রহও তেমন নেই। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি; বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী দেশগুলোর তালিকায় আমেরিকা সবার শীর্ষে। ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৩৬ জন আমেরিকান বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। শুধু কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই ৮০ জন শিক্ষক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমেরিকায় বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ এত বেশি যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও বিজ্ঞানী-গবেষক আমেরিকায় চলে যান।

কিন্তু মাগরেবের (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় আফ্রিকা) দরিদ্র আরব দেশ মরক্কোর সন্তান নিদাল গুয়েসুম সেই আমেরিকায় উচ্চতর গবেষণার সুযোগ পেয়েও বেশি দিন থাকেননি। পিএইচডির পর পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে নাসায় দুই বছর কাজ করেই ফিরে যান স্বদেশে। শিক্ষকতা শুরু করেন ইউনিভার্সিটি অব ব্লিদায়। তারপর পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন কুয়েতের কলেজ অব টেকনোলজি স্টাডিজে। ২০০০ সাল থেকে অধ্যাপনা করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব শারজার পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগে। ৫৬ বছর বয়সী এই জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীর মূল আগ্রহের বিষয় গামা-রে অ্যাস্ট্রোফিজিকস; ছায়াপথে পজিট্রন-ইলেকট্রন বিনাশপ্রক্রিয়া নিয়ে তিনি বেশ কিছু সন্দর্ভ রচনা করেছেন, সেগুলো উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে।

কিন্তু এই ভদ্রলোকের একমাত্র আগ্রহের বিষয় বিজ্ঞান নয়। তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে আছে মানুষ, সুনির্দিষ্টভাবে মুসলিম বিশ্বের মানুষ, তার শিক্ষা ও সামগ্রিক অগ্রগতি। তাই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমিত রেখেছেন জন্মভূমি আলজেরিয়া আর আরব দুনিয়ার মধ্যেই। তিনি মুসলিম সংস্কৃতিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন চান। ২০১০ সালে তিনি প্রকাশ করেছেন *ইসলামস কোয়ান্টাম কোয়েশ্চন: রিকনসাইলিং মুসলিম ট্রাডিশন অ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স* নামে একটি গ্রন্থ, যেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, মুসলিম বিশ্বকে বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিতে হবে।

অবশ্য আমার এই লেখা তাঁর সম্পর্কে নয়। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে সম্প্রতি পাকিস্তানের গবেষক ড. আতহার ওসামার সঙ্গে যৌথভাবে যে গবেষণা করেছেন, তার কিছু তথ্য ও পর্যবেক্ষণ এ লেখায় তুলে ধরতে চাই। এটা এ মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে এই কারণে যে সাম্প্রতিক জঙ্গি সহিংসতার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তু নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে। অধ্যাপক নিদাল ও ড. আতহারের যৌথ গবেষণা প্রতিবেদনে যদিও বাংলাদেশের প্রসঙ্গ নেই, তবু তা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশও আছে।

পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক ডন-এ গত ৪ জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছে এই দুঃখবোধের সঙ্গে যে বিশ্বের ১৬০ কোটি মুসলমান, যাঁরা ৫৭টা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে তাঁদের অবদান অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কম। নোবেল পুরস্কারের শতাধিক বছরের ইতিহাসে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র তিনজন মুসলমান বিজ্ঞানী। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়ও ওআইসির সদস্যদেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা গুটি কয়েক। ২০১৪-২০১৫ বছরের কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। শীর্ষ ৪০০টির মধ্যে আছে মাত্র ১৭টি; ৩০০ ও ৪০০-র মধ্যে আছে মাত্র ১১টি। মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা হয় খুবই কম, গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় কম, দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রকট এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়ানোর ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা, সৃজনশীলতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হয় না।

গবেষকদ্বয় লক্ষ করেছেন, মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর পাশাপাশি দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি পড়ানো হয় না। এমনকি বিজ্ঞানের ইতিহাসও তাদের পাঠ্যতালিকায় থাকে না। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংকীর্ণ পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শিক্ষার্থীদের মনে বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, খণ্ডিতভাবে বিজ্ঞান পড়ার ফলে চিন্তাপদ্ধতি হয় অবৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির মূল কথা জিজ্ঞাসা বোধ করা এবং সেই জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে অভিজ্ঞতাপ্রসূত তথ্য-উপাত্ত (এমপেরিক্যাল ডেটা) ব্যবহার করা। বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন, ইতিহাস ও লিবারাল আর্টসের সমন্বয় সাধনের ফলে যে নমনীয় (ফ্লেক্সিবল) ও উদার (লিবারাল) মনোভঙ্গি তৈরি হয়, মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার প্রকট অভাব রয়েছে।

এই পয়েন্টে আমরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তর্ক-বিতর্কের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। অনেকেই বলছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাঁরা প্রকৌশল ও ব্যবসায় প্রশাসনের মতো চাকরিমুখী বা ক্যারিয়ার-ড্রিভেন বিষয়গুলোতে পড়াশোনা করেন, তাঁদের মধ্যে র‍্যাডিক্যালাইজেশনের প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রিধারীদের মধ্যে কট্টরপন্থা বা মৌলবাদী মানসিকতার কথাও বলা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে তপ্ত তর্ক-বিতর্ক চলছে, সেখানেও শোনা যাচ্ছে ওসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও অন্যান্য কলা-মানবিক বিদ্যা পড়ানো হয় না বলেই সেগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রপন্থার প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। যদিও এসব কথা একপেশে এবং এ বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত আমাদের হাতে নেই, তবু সাধারণভাবে এটা পুরোপুরি ভিত্তিহীনও নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেছিলেন, এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষকদের একটা বড় অংশের মধ্যেও উদার চিন্তার অভাব ও কট্টরপন্থার প্রতি ঝোঁক রয়েছে।

অধ্যাপক নিদাল গুয়েসুম ও ড. আতহার ওসামার গবেষণায় গোটা মুসলিম দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা ধরা পড়েছে, বাংলাদেশ যে বাইরে থাকতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। এমনকি আমার মনে হয়, উন্নত বিশ্ব বলে পরিচিত ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই ধরনের প্রবণতা কিছুটা কম মাত্রায় হলেও আছে। যেমন উইলিয়াম জিনসার নামের এক মার্কিন অধ্যাপক তাঁর *রাইটিং টু লার্ন* গ্রন্থের ভূমিকার এক জায়গায় লিখেছেন, আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যেসব শিক্ষার্থী মানবিক বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে পড়েন, তাঁরা বিজ্ঞান ও গণিতের নাম শুনলে ভয়ে আঁতকে ওঠেন। একইভাবে বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষার্থীরা আঁতকে ওঠেন মানবিক বিদ্যাগুলোর নাম শুনলে। সুতরাং এই প্রবণতা বৈশ্বিক, যদিও মাত্রাগত তফাত বেশ আছে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে উন্নত অমুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পার্থক্য হলো, ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর পাঠ্যসূচিতে মানবিক বিদ্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিশেষত, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ও হোলিস্টিক পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয়।

উগ্রপন্থা বা জঙ্গিবাদ নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গটি এসে পড়েছে এই কারণে যে সাম্প্রতিক জঙ্গি তৎপরতায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এর আগে এমন প্রশ্ন এতটা আলোচিত হয়নি যে প্রকৌশল বা ব্যবসায় প্রশাসনের মতো বিষয়গুলোর পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় আছে কি না, না থাকলে নেই কেন? কেউ খুব জোর দিয়ে বলেনওনি যে তাঁদেরও এগুলো পড়া প্রয়োজন বা এমন প্রশ্ন ওঠেনি যে প্রকৌশলী, ব্যাংকার কিংবা চিকিৎসক যদি সাহিত্য ইত্যাদি না পড়েন, তাহলে ক্ষতিটা কোথায়।

এ দেশে তথাকথিত মৌলবাদী উগ্রপন্থা ও জঙ্গি তৎপরতা যখন প্রধানত মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ছিল, তখন এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার কথা উচ্চারিত হয়নি। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ও পাঠসূচিতে কিংবা উচ্চশিক্ষা-সম্পর্কিত ধারণা ও বোঝাপড়ায় কোনো ঘাটতি আছে কি না, এমন প্রশ্ন ওঠেনি। এখন উঠেছে, এবং এক দিক থেকে ভালোই হয়েছে। এখন যদি উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়, নানা রকমের প্রশ্ন জাগে, তাহলে জাতির উপকারই হবে।

উগ্রপন্থার মূল সমস্যা তো মানুষের মনে; তার বিশ্ববীক্ষায়; জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা ও বিশ্বাসে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেমন মন তৈরি হচ্ছে, কী বিশ্ববীক্ষা সৃষ্টি হচ্ছে—এখন সেদিকেই ভালো করে তাকাতে হবে। সংকীর্ণ, অনুদার, অসহিষ্ণু ও আগ্রাসী মন সহজেই উগ্রপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। সে মন যদি হয় তরুণ, কাঁচা আবেগে সদা কম্পমান, তাহলে ধ্বংসাত্মক ভাবাদর্শের দিকে তাকে টেনে নেওয়া যায় অপেক্ষাকৃত সহজে। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে যাওয়া পতঙ্গের মতো যে তরুণেরা মা-বাবা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব, খেলার মাঠ, সুন্দর ক্যাম্পাস, কর্মময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন—এক কথায় জাগতিক সবকিছু বিসর্জন দিয়ে 'জিহাদ'-এর টানে 'নিখোঁজ' হয়ে গেছেন, তাঁদের মূল সমস্যা তো তাঁদের মনের গভীরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এমন মানুষ তৈরি করা, যাঁরা অর্জন করবেন চিন্তা ও দৃষ্টির উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

কী উপায়ে তা করা যাবে, এ নিয়ে এবার চিন্তাভাবনা ও গবেষণা শুরু হোক।

● মশিউল আলম : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।
mashiul.alam@gmail.com